02

দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ 19-JUL-1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

সন্ত্রাস, শিক্ষাঙ্গন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

সরকারী কর্মসূচীতে একেবারেই শীর্ষস্থানে এসে পড়েছে সন্ত্রাসের উৎপাদন। কোন না কোন চেহারার সন্ত্রাসের উপস্থিতি নেই, এমন জায়গা দেশের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সন্ত্রাসের শিকার গ্রামের নিরীহতম নারী থেকে সমাজের উঁচুতলার, প্রশাসনের উঁচুস্তরের, আপাতদৃষ্টিতে ক্ষমতাবান ব্যক্তি— সবাই। এর মধ্যেও আছে কয়েকটি চিহ্নিত এলাকা। সংবাদপত্রের পাঠক যাঁরা, তাঁরা সহজেই বলতে পারবেন, কারণ এই চিহ্নিত এলাকাগুলো প্রায়শই সংবাদের বিষয় হয়ে ওঠে।

আমি লক্ষ্য করেছি, আমার ধারণা আমার মতো অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সমাজ থেকে, শিক্ষাঙ্গন থেকে, সন্ত্রাস দমন গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ পেয়েছিল। নির্বাচনী প্রচারেও একই জিনিস লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সরকার গঠনের পরও প্রসঙ্গটিকে যথোপযুক্ত জোর দিয়ে সন্ত্রাস দমনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি একজন দৃঢ়চেতা ও প্রকৃতঅর্থে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ে জানি। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সরকারে আমরা এক সঙ্গে কাজ করেছি। তখন তাঁর দায়িত্ব ছিল ভিন্ন ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের নিয়মিত পরিষদ সভায়, বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমাদের মতামত বিনিময়ে আমি তাঁর মধ্যে ওই দৃঢ়তার লক্ষণ দেখেছি। তাঁকে আমি এই অবসরে একটুখানি সতর্কবাণী শোনাব। সন্ত্রাস দমন কাজটি সহজ হবে না, উৎপাদনও অসম্ভব। সমাজে কোন না কোনরূপে একটি মাত্রার সন্ত্রাস থাকবেই, তবে সেটা সহনীয় মাত্রায় হলেই সমাজ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। সমস্যার জটিলতা তিনি বুঝতে পেরেছেন বলেই এ মাসের ২০ তারিখে একটি ব্যাপক আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সরকার গঠনের পর পরই এ উদ্যোগ গ্রহণ থেকে বোঝা যায়, সমস্যাটিকে তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও তার সমাধানের পথ খোঁজা কতটা জরুরী বিবেচনা করেছেন। তাঁর এই উদ্যোগের একটা শুভ ফল আশা করছি। এই আলোচনায় সংশ্লিষ্ট সকল মহলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে, রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা ভিন্নমতের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ছাত্র সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপস্থিতি ও তাঁদের মুক্ত মতামত প্রকাশ, সন্ত্রাস সংক্রান্ত যে কোন আলোচনা জরুরী মনে করতে হবে।

সন্ত্রাসীদের তৎপরতা হঠাৎই বেড়ে গিয়েছে, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, এমন একটি উদ্বেগের কথা শুনতে পাচ্ছি ও সংবাদপত্রে দেখতে পাচ্ছি। পুলিশের একজন কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি নাকি জবাবে বলেছেন, চিন্তা করবেন না, প্রদীপ নেবার আগে প্রদীপ শিখার শেষ নাচুনি এটা। কথাটা শুনতে ভাল হলেও প্রত্যয় জন্মানোর মতো কিছু নয়। এ ধরনের স্মার্ট কথা রাজনীতিকরা বলে থাকেন। মাগুরা উপনির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনারও বলেছিলেন, স্মার্ট কথাবার্তাকে আমি একটু সন্দেহের চোখে দেখি।

সন্ত্রাস দমন কাজটা যে কত কঠিন, উত্তর আয়ারল্যান্ড পরিস্থিতির সামাল দিতে গিয়ে বেসামাল ব্রিটিশ সরকার সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। কেউ হয়ত বলবেন, উত্তর আয়ারল্যান্ড বা শ্রীলঙ্কার তামিল এলাকার সন্ত্রাসকে কেবল সন্ত্রাস বলা যায় না। আইআরএ বা তামিল টাইগার— এরা একটি রাজনৈতিক লক্ষ্যে কাজ করছে। সে লক্ষ্য ভাল কি মন্দ, সে প্রশ্ন মুলতবি রেখে ওই সত্যটিকে মেনে নিতে হবে। বাংলাদেশের সন্ত্রাস বর্তমানে যে রূপ নিয়েছে, তাকে কোনভাবেই মহিমান্বিত করার সুযোগ নেই। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বরং কয়েক বছর একটা রাজনৈতিক প্রতিরোধ সন্ত্রাসের রূপ গ্রহণ করেছিল এবং সেটা দমন করতে গিয়ে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছিল, অনেকের দৃষ্টিতে তার কঠোরতা ছিল অতিমাত্রায় বেশি এবং সে জন্য আজও আওয়ামী লীগকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আপাতদৃষ্টিতে অরাজনৈতিক সন্ত্রাস যেভাবে শিকড় গেড়েছে সমাজের, প্রশাসনের ও শিক্ষাঙ্গনের সকল স্তরে এবং সেই সন্ত্রাসের মোকাবিলায় যেভাবে একটির পর একটি সরকার ব্যর্থ হয়েছে, তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। স্পষ্ট কয়েকটি সামাজিক কারণ সহজেই চিহ্নিত হবে ; ব্যাপক ; দারিদ্র্য, কর্মহীনতা, বিশেষত, শিক্ষিত তরুণ সমাজের বেকারত্ব। খুব সহজ হবে না এর সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করা ও বের করার পর তার প্রতিকার করা। অনেকে বলবেন, এটা এমন কি আর জটিল সমস্যা। পুলিশ পারছে না, যেহেতু পুলিশকে পারতে দেয়া হচ্ছে না, পরিষ্কার ইঙ্গিতটা হচ্ছে, ক্ষমতাসীন সরকারের অনৈতিক ও অমার্জনীয় হস্তক্ষেপের প্রতি। এটি একটি অতি পরিচিত ও অতি আলোচিত 'ওপেন সিক্রেট'; 'ওপেন সিক্রেট' হলেই কি সমস্যাটি সহজ হয়ে যায়?

বিশেষ বিশেষ মহলে দুর্নীতি যখন মাটির গভীরে শিকড় বিস্তার করে, যেমন করেছে শুধু আমাদের এই হতদরিদ্র বাংলাদেশেই নয়। আমাদের মতো দরিদ্র নয়, প্রাকৃতিক সম্পদে ধনী, এমন অনেক দেশেই, তখন দুর্নীতি, রাজনীতি, প্রশাসন— সব কিছু মিলিত-মিশ্রিত হয়ে একটি আলাদা ও সবল সংস্কৃতি জন্মলাভ করে ও দিনে দিনে বিকশিত হয়। মূল প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও দৃঢ়তা যেখানে আছে, সেখানে এটা সম্ভব নয়। যেমন ব্রিটিশ শাসনে ভারতে। মোটামুটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনও এর অন্তর্ভুক্ত— এই উত্তরাধিকার নিয়েই (প্রায়) পঞ্চম বছর পূর্বে আমরা বিদেশী শাসনমুক্ত হই। কিন্তু স্বদেশী শাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের নিরপেক্ষতা বেশিদিন বজায় থাকেনি। পুলিশ কিভাবে দিনে দিনে তার কার্যকারিতা হারিয়েছে, সে বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কয়েকজন প্রবীণ ও অবসরপ্রাপ্ত আইজি মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন। এঁদের মধ্যে একজন তাঁর প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সহযোগী উপদেষ্টা। ব্রিটিশ আমলে কিভাবে এলাকার সন্ত্রাসীদের কড়া নজরে রাখা হতো, তার একটি ভাল বর্ণনা দিয়ে ও পৃথকভাবে সন্ত্রাস দমন আইন প্রণয়নের অযৌক্তিকতা দেখিয়ে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন এক সময়ের রাজনীতিবিদ ও অব্যাহতভাবে আইনজীবী জনাব সিরাজুল হক। বিগত সরকারের বিতর্কিত সন্ত্রাস দমন আইন নিয়ে যে সময় তুমুল আলোচনা চলছিল, লেখাটি ওই সময়ের লেখা। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি ওই লেখাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জনাব সিরাজুল হককে যদি ঠিক বুঝে থাকি, তাঁর বক্তব্য ছিল এই ঃ নতুন আইনের সাহায্যে নয়, এক্ষেত্রে একটি পুরনো ব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগই সন্ত্রাস দমনে সহায়ক হতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে বর্তমান সরকারকে ও বর্তমান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মনে রাখতে হবে— ব্রিটিশ আমলের সমাজ এখন এতটাই বদলে গেছে যে ওই সময়ের ব্যবস্থা আজকের দিনে হয়ত কার্যকর হবে না। ওই সময়ে আমাদের গ্রামের বাড়িতে একটি দোনলা বন্দুক-ই আমাদের নিরাপত্তার সহায় ছিল দীর্ঘকাল। এখন আমাদের গ্রাম থেকে অল্প দূরে, শৈলকুপায়-ঝিনাইদহে সশস্ত্র গোপন বাহিনীর সদস্যরা প্রায়শই মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে লড়াই করে, নিজেরা মরে ও প্রতিপক্ষকে মারে। ব্রিটিশ এ দেশে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, সেই অবস্থানে ফিরে যেতে হলে বর্তমান সরকারকে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। অত্যন্ত কঠিন হবে সে কাজ।

সন্ত্রাস প্রসঙ্গে আলোচনায় অনিবার্যভাবেই এসে যায়, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের প্রসঙ্গটি। আজকের সংবাদপত্রে দেখলাম, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের এক প্রতিনিধিদলকে সাক্ষাতকার দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমন এই প্রতিনিধিদলের অন্যতম দাবি। বিষয়টির গুরুত্ব আমরা সকলেই জানি। ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসী ছাত্ররা সবাই সন্ত্রাসী হয়ে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না— অনেকেই ভর্তি হওয়ার পর সন্ত্রাসী হয় বা হতে বাধ্য হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলের দাবিতে সন্ত্রাস দমন বিষয়ে একটি সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। তবে সে কমিটি কাজ করেনি বা করতে পারেনি। এটা তাঁর কথা। এর সঙ্গে আমি যোগ করব আমার কথা। বিগত সরকার (১৯৯১-৯৬) ক্ষমতায় এসেই দু'টি কমিটির নাটকীয় ঘোষণা দিয়েছিলেন, একটি সন্ত্রাস বিষয়ক, দ্বিতীয়টি সেশনজট বিষয়ক। কি মনে করে ওই সরকার আমাকে দ্বিতীয় কমিটির আহ্বায়ক করেছিলেন আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই। দু'সপ্তাহের মধ্যেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল কমিটি সম্পর্কে সরকারের কোন প্রকৃত দায়বদ্ধতা নেই। আমি পত্রযোগে অব্যাহতি নিয়ে চলে আসি। এরপর একজন মঞ্জুরি কমিশনের সদস্যকে আহ্বায়ক করে কমিটি পুনর্গঠিত হয়। সে কমিটি আমি যতদূর জানি— কোনদিন বসেনি, কোন রিপোর্টও দাখিল করেনি। প্রথম কমিটিকে সময় দেয়া হয়েছিল চার সপ্তাহ। ছয় কি সাত মাস পরে সে কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করে, তার অন্তঃসারশূন্যতা ইচ্ছা করলেই বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী জানতে পারবেন। কারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি পূর্বঐতিহ্য মতো একেবারেই স্মৃতিহীনতার প্রতীক না হয়ে থাকে, তাহলে ডঃ সালেহ আহমদের নেতৃত্বে গঠিত ওই কমিটির রিপোর্ট তাঁরা পড়ে দেখতে পারেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্বন্ধে আমার ধারণা— A ministry without memory. আমি ১৯৯১ সালে ঐ মন্ত্রণালয়ে ১৯৮৮ সালের শিক্ষা কমিশনের একখণ্ড রিপোর্ট পাইনি। পরে অবশ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কোন এক জায়গা থেকে আমাকে এক কপি রিপোর্ট ওঁরা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। সন্ত্রাস প্রসঙ্গে নতুন চিন্তা করার আগে উচিত হবে এ বিষয়ে অতীতের চিন্তা কি ছিল, তার একটি ধারাবাহিক বিবরণ তৈরি করা। প্রেস ইনস্টিটিউট কি পারবে না, গত পাঁচ বছরের সংবাদপত্রের রিপোর্টগুলোকে সাজিয়ে দিতে? [১৬.০৭.৯৬]